রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসংগীতের রূপান্তরিত রূপ – ভক্তিগীতি

ডঃ মৌসুমী পাল

সারসংক্ষেপঃ

ব্রহ্মসংগীতের গোড়াপত্তন হয় রাজা রামমোহনের হাতে। রামমোহনের পর আদি ব্রাহ্মসমাজের সব দায়িত্ব দেবেন্দ্রনাথের উপর বর্তিত হয়। ব্রহ্মসংগীতের জন্য আকারমাত্রিক স্বরলিপির উদ্ভাবন করেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর। পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর এই স্বরলিপির কিছু কিছু পরিমার্জনা করেন। একসময় রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসংগীত কাব্যসংগীতে ক্রমপরিণতি লাভ করল। কাব্যগুণের সঙ্গে বাছাই করা সুর ও তাল নতুন উদ্ভাবিত সুরের সঙ্গে যুক্ত হল। তাই রবীন্দ্রনাথের রচনার এই বিশিষ্ট শ্রেণীর চরম প্রকাশ তত্ত্বের ভিত্তিতেই পরবর্তী যুগের ব্রহ্মসংগীতের মূল্যায়ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

Abstract :-

Raja Rammohan Roy was the creator of Brahmasangeet. After him, Debendranath Tagore took hold of the responsibility of Adi Brahmasamaj. Dwijendranath Tagore inovated Akarmatrik Swaralipi for Brahmasangeet. Later Jyotirindranath Tagore refined few parts of this Swaralipi. Eventually the Brahmasangeet by Rabindranath Tagore came to be known as Kabyasangeet. Along with the quality of lyrics certain selected tunes and rhythms were added to newly revised tune. Brahmasangeet of the new era should be assessed based on the widespread prominent class of Rabindranath's composition.

কী-ওয়ার্ডস – ব্রহ্মসংগীত, রামমোহন রায়, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাব্যসংগীত, মূল্যায়ণ।

ব্রহ্মসংগীতের গোড়াপত্তনের পর রাজা রামমোহন ১৮২৫ খ্রীস্টাব্দে আত্মীয় সভার প্রবর্তন করে সেখানে তাঁরই সংগীত শিক্ষক কালীমির্জাকে গায়ক হিসাবে নিযুক্ত করেন। ব্রহ্মসংগীতের সূত্রপাত এখান থেকেই মনে করা হয়। পরে ১৮২৮ সালে যখন ব্রহ্মসভা নিজস্ব গৃহে স্থায়িত্ব লাভ করে তখন সংগীতকে উপাসনায় প্রাধান্য দেওয়া হয়। এর জন্য রামমোহন নিজে গান রচনা করেন। পরে কৃষ্ণানন্দ ব্যাসদেবের 'সংগীতরাগকল্পদ্রুম' গ্রন্থে প্রায় ৯০ টিরও বেশি গান স্থান লাভ করেছে।

আদি ব্রাহ্মসমাজের সব দায়িত্ব নেওয়ার পর দেবেন্দ্রনাথ নিজে গান রচনা করা শুরু করেন এবং এর পরবর্তীকালে পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ এবং ভ্রাতুষ্পুত্র গণেন্দ্রনাথ, গুণেন্দ্রনাথ ও জোড়াসাঁকো পরিবারের অনেককেই ব্রহ্মসংগীত রচনায় উৎসাহিত করেন। আগে থেকেই বিষ্ণু চক্রবর্তী

গায়ক রূপে নিযুক্ত ছিলেন। সে যুগের অসংখ্য রচনার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের 'ব্রহ্মসংগীত' গ্রন্থে। আদি ব্রাহ্মসমাজ এর কাঙ্গালীচরণ সেন এই সমস্ত গানের স্বরলিপি প্রকাশ করেন। এই সময় লক্ষ্য করা যায় যে ধর্মীয় উদ্দেশ্যের সঙ্গে এই জাতীয় বাংলা গান ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়েছিল। পরে ভজন, কীর্তন, স্তোত্র, বেদমন্ত্রগান, কাব্যসঙ্গীত প্রভৃতি থেকে অনেক গান ব্রহ্মসংগীতের আওতায় এসে পড়ে।

সেইজন্য ব্রহ্মসংগীতের ঐতিহ্যের মূল্যায়ণ বিশেষভাবে করা প্রয়োজন। যাঁরা এই ধরনের গানের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত তাঁদের মধ্যে কয়েকজন হলেন কালী মির্জা, রামনিধি গুপ্ত, দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিষ্ণু চক্রবর্তী, দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর, যদুভট্ট, রাধিকা প্রসাদ গোস্বামী, স্বর্ণকুমারী দেবী, শ্যাম সুন্দর মিত্র, রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায়, ইন্দিরা দেবী, সরলা দেবী প্রমুখ।

সে যুগের স্বল্পায়তন রাগসঙ্গীত চর্চার ক্ষেত্রে সমাজগৃহে রামমোহনের সঙ্গীত পরিবেশ সৃষ্টি একটি বিশেষ কাজ। রাগসঙ্গীত যখন মুষ্টিমেয় ঋনীগৃহে আবদ্ধ, রামমোহন তখন সমাজগৃহে সাধারনের জন্য সঙ্গীতের দ্বার খুলে দিলেন। ফলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একাংশ সঙ্গীতের প্রতি যে আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছিল, উত্তরোত্তর তার শ্রীবৃদ্ধি হতে থাকল। এই প্রসঙ্গে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্র জীবনী' তে লেখার সারমর্ম করলে দাঁড়ায় যে তখনকার দিনে রাজা রামমোহন রায় ধর্মমন্দিরে সঙ্ঘউপাসনার প্রবর্তক ছিলেন, মন্দিরের উচ্চাঙ্গ তাল, মান, লয় সংযোগে গানের প্রবর্তন তিনিই করেন। রামমোহনের আরদ্ধ কার্য দেবেন্দ্রনাথের দ্বারা উজ্জীবিত হয়; তিনি আদি ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে উৎকৃষ্ট সঙ্গীতের ব্যবস্থা করেন। ব্রহ্মসঙ্গীত তিনি স্বয়ং রচনা করেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, গুণেন্দ্রনাথ নানা রকম হিন্দি গান থেকে সুর আহরণ করে বা হিন্দি গান ভেঙে ব্রহ্মসঙ্গীত রচনায় প্রবৃত্ত হন। রবীন্দ্রনাথের সামনে ভগবদ্‌বিষয়ক সঙ্গীত রচনার আদর্শ তাঁরাই স্থাপন করে গিয়েছিলেন। রামমোহনের প্রয়াস ঠাকুরবাড়ির সাঙ্গীতিক পরম্পরায় পূর্ণতা পেয়েছিল। ব্রহ্মসঙ্গীত এক বিশেষ আবেদন নিয়ে এসেছিল। তৎকালীন গান বাজনার জগতে সৃষ্টি করেছিল এক বিশেষ আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক রুচি।

সংগীতকে ব্যক্তিগত আবেগের দ্বারা গ্রহণ করার শিক্ষা নিঃসন্দেহে দেবেন্দ্রনাথের জীবন থেকেই সংক্রামিত। সংগীতের ভক্তি ও মুক্তির আনন্দ, শব্দের ব্যঞ্জনা, সুরের উল্লাস রামমোহনের উত্তরসাধক এই মহাত্মার কবিপ্রাণের গভীরে প্রবেশ করেছিল। তাঁর আত্মস্মৃতি থেকে জানতে পারি হিমালয় ভ্রমণকালে গভীর রাতে 'যোগী জাগে' গানটি গাইতে তাঁর কী পুলক সঞ্চারিত হত। আশ্চর্য কাব্যগর্ভ ব্রহ্মসংগীত রচনার জন্য তরুণ

রবীন্দ্রনাথকে যে তিনি পুরস্কৃত করেছিলেন, যে সংবাদ সুবিদিত, পরিবারে সংগীতস্রোতের প্রবাহ তিনিই এনে দিয়েছিলেন। রামমোহনের মত মহর্ষি দেবও সংস্কৃত স্তোত্র রচনা করেছেন বাংলা ব্রহ্মসংগীতও রচনা করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের সংগীত শিক্ষাগুরুদের প্রভাবঃ- রবীন্দ্রনাথ যে বিষ্ণু চক্রবর্তীর কাছে সংগীত শিক্ষা করেছিলেন, তিনি দীর্ঘকাল আদি ব্রাহ্মসমাজের গায়ক ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের অন্যতম সংগীতদীক্ষাগুরু যদুভট্ট এবং ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম গায়ক কৃষ্ণপ্রসাদ চক্রবর্তীও সুরযোজনা করতেন। হিন্দিগান ভেঙে বাংলা গান রচনা করা, বিশেষ করে ব্রহ্মসংগীত রচনা করা, ঠাকুর পরিবারের প্রতিটি তরুণ স্রষ্টার কাছে ছিল নেশার মতো। রবীন্দ্রনাথের মধ্য যৌবনকাল পর্যন্ত রচিত রবীন্দ্রসংগীত এইভাবে মার্গসংগীতের দ্বারা সমৃদ্ধ।

অধ্যাপক রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একটি প্রবন্ধে লিখেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ, ‘‘আনুমানিক ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে সংগীতাচার্য্য রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী ও শ্যামসুন্দর মিশ্রের সংস্পর্শে আসেন। ইহাদের নিকট বহুসংখ্যক ধ্রুপদ ও খেয়াল সংগ্রহ করিয়া তাহার অনুকরণে ব্রহ্মসংগীত রচনা করেন। রবীন্দ্রনাথ রচিত ধর্মসংগীতের মূল হিন্দি গানের অধিকাংশই রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত সঙ্গীতমঞ্জরী ও গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত সঙ্গীতচন্দ্রিকা গ্রন্থে প্রকাশিত আছে। এতদ্ব্যতীত ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী প্রণীত কণ্ঠকৌমুদী ও কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত গীত সূত্রসার গ্রন্থে কিছু কিছু মূল গান প্রকাশিত আছে’’।

ব্রহ্মসংগীতের বৈশিষ্ট্যঃ-

ব্রহ্মসংগীতের সাংগীতিক বৈশিষ্ট্য গুলি মোটামুটি নিম্নরূপ:-

এক) ব্রহ্মসংগীতের সুর ও তাল ছিল ধ্রুপদ গানের পক্ষে বিশেষ উপযুক্ত। কিন্তু গানে কথার ভাব ও তালের সমন্বয়সাধনই প্রধান লক্ষ্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্ব রচিত ধ্রুপদভিত্তিক গানের বিশেষ লক্ষ্য ছিল ব্রহ্মসঙ্গীত।

দুই) জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর বড়দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথের সঙ্গে মিলে যে কোন গানের সুরে নতুনত্ব খুঁজে পেলেই তাকে ব্রহ্মসংগীতে রূপান্তরিত করতেন।

তিন) ব্রহ্মসংগীতে ধ্রুপদ, টপ্পা, কীর্তন, রামপ্রসাদীসুর, লোকসংগীত এর সুরকে যেমন গ্রহণ করা হয়েছে, তেমনি রাগের নিয়মাবলী সর্বত্র সমানভাবে রক্ষিত হয়নি।

চার) রবীন্দ্রনাথের গানের বিষয়বস্তুতে যখন আধ্যাত্মিকতার সাথে মানবিক মূল্যবোধ, প্রকৃতি ও সৌন্দর্যবোধ যুক্ত করা হল এবং নতুন রূপে কাব্য মহিমা প্রকাশিত হল ব্রহ্মসঙ্গীত তখন আর শুধু ধর্মীয়ভাবাপন্ন হয়ে রইল

না।লক্ষ্য করা যায় যে রবীন্দ্রনাথের কাব্যরচনার বিশিষ্ট যুগ অর্থাৎ সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালির পর থেকেই ধর্মীয় ভাবের সঙ্গে কাব্যসচেতনতার নিগূঢ় সংযোগ হল।অর্থাৎ ১৮৯৫ সাল থেকে ব্রহ্মসংগীতের এই পরিণতি লক্ষ্য করা গেল। এর পরের যুগে বিংশ শতকে ১৯০৮ - ১০ সাল নাগাদ গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য প্রভৃতি রচনায় আধ্যাত্মিক রসের উপর কাব্যতরঙ্গ ও কাব্যসুষমা বয়ে গিয়েছিল।

ব্রাহ্মধর্মের মূলকথাঃ- ব্রাহ্মধর্মের মূলকথা নিরাকার উপাসনা ও সত্যধর্ম পালন। হিন্দুদের পৌত্তলিক উপাসনার সঙ্গে তার যে বিরোধই থাকুক না কেন, ধর্মের মূল বৈশিষ্ট্যে কোনও বিরোধ নেই। কিন্তু ব্রহ্মসংগীত গুলিতে ব্রহ্মের মহিমাপ্রকাশে ভক্তের আতিশয্য চূড়ান্ত হয়েছে।

ঈশ্বরকে পিতা বলে সম্বোধন করা শাস্ত্রসম্মত হতে পারে, কিন্তু কাব্যসম্মত হয়ে ওঠে না- অধিকাংশ ব্রহ্মসংগীতের পিতৃঘটিত পদগুলি তাই কবিত্বে পীড়াদায়ক মনে হয়। রবীন্দ্রনাথও প্রথম জীবনে পিতৃনামে বহু গান রচনা করিয়াছিলেন যেগুলি আন্তরিকতাহীন। কিন্তু কালক্রমে উদারতা প্রবেশ করেছে এবং ঈশ্বরকে পিতার বদলে মাতৃসম্বোধনে অভিহিত করা হয়েছে। অনেক গানে মাতৃসম্বোধন শেষ পর্যন্ত দেশাত্মবোধক গানে পরিণত হয়েছে, তাই অনেক ব্রহ্মসঙ্গীত সংকলনে স্বদেশবিষয়ক গানও ব্রহ্মসংগীতরূপে পরিচিত ও নির্দেশিত। রবীন্দ্রনাথের সুবিখ্যাত 'জনগণমণ অধিনায়ক' গানটি প্রথম গীত হয় ১৯১১ সালে কলকাতা কংগ্রেসের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে (২৭ ডিসেম্বর), তারপর মাঘ ১৩১৮ সংখ্যায় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়, তাতে গানের শিরোনাম ছিল 'ভারতবিধাতা' এবং নিচে লেখা ছিল 'ব্রহ্মসংগীত' ২৫শে জানুয়ারী ১৯১২ তারিখে জোড়াসাঁকোর মাঘোৎসব উপলক্ষ্যেও এটি গীত হয়েছিল।

অসাম্প্রদায়িক মাতৃচেতনাই রবীন্দ্রনাথের 'জননী তোমার করুণ চরণখানি' এবং 'তিমির দুয়ার খোল' গানগুলিতে কৃতার্থ হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের 'প্রথম আদি তব শক্তি আদি পরমোজ্জ্বল জ্যোতি' গানটির পূর্বাভাস পাওয়া যায় সত্যেন্দ্রনাথের একটি ব্রহ্মসংগীতে-

"প্রথম কারণ আদিকবি শোভন তব বিশ্বছবি
তটিনী নির্ঝর ভূধর সাগর সব কি সুন্দর নেহারি"।

ব্রহ্মসংগীত রচনার মধ্যপর্বে, ঠাকুরবাড়ির কবি প্রতিভার আগ্রহাতিশয্যে, বহুতর হিন্দিগানের সুরে বাংলায় ব্রহ্মসংগীত রচনার বিপুল প্রেরণা দেখা দিয়েছিল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও অজস্র হিন্দিগান ভেঙে ব্রহ্মসংগীত রচনা

করেছেন। গানরচনার উদ্দীপনাই ছিল প্রবল, তাই কবিত্বের স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ বাধাহীন হতে পারিনি।

রামমোহনের ব্রহ্মসংগীতগুলি ছিল সংসারী মনের বৈরাগ্যসংগীত, বিষয়কর্মদাস চিত্তের কাছে পারত্রিক মুক্তির জন্য ব্যগ্রতাসৃষ্টির গীতপ্রয়াস। কালক্রমে ব্রাহ্মধর্মের রূপ বদলাল, জ্ঞানের সঙ্গে ভক্তি এল, প্রেম এল। ব্রহ্মসংগীতেও এল জীবনাসক্তি, প্রকৃতি প্রীতি ও বিশ্বচেতনা।

রামমোহন পরবর্তী যুগে ব্রহ্মসংগীতের প্রসারঃ- রাজা রামমোহন রায় তাঁর প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মসমাজে সংগীতকে উপাসনার অঙ্গরূপে গ্রহণ করেন। স্বয়ং ব্রহ্মসংগীত রচনা করে তিনি নিরাকার ব্রহ্মের স্তব গান রচনার যে ধারা প্রবর্তন করেন তা সমকালে যেমন জনপ্রিয়তা লাভ করে, পরবর্তীকালে তা আরো বিপুলভাবে পল্লবিত হয়ে ওঠে। রামমোহন রায়ের তিরোধানের পর দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন ব্রাহ্মসমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন, তখন তিনি তাঁর সংগীতাদর্শকে বাস্তবায়িত করার জন্য আন্তরিক উদ্যোগ গ্রহণ করেন। রামমোহন-দেবেন্দ্রনাথ আচরিত ধারায়ই ব্রহ্মসংগীত রচয়িতা রূপে রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রকাশ। দুটি জিনিসকেই পিতৃগৃহে প্রবলভাবে পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। একটি স্বাদেশীকতা ও অপরটি ব্রহ্মসংগীতানুষ্ঠান। কখনো কখনো এ দুটিতে মেশামেশি হয়ে যেত। কিন্তু তা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের পূজা সংগীতগুলি ব্রহ্মসংগীতের গোষ্ঠী কেন্দ্রিকতা ও ভক্তি প্রকাশের অভ্যস্ত রীতির গন্ডিকে পেরিয়ে জীবনের প্রতি গভীর প্রীতি, মর্তমমতা, দিনযাপনের আনন্দ ইত্যাদিতে প্রতিফলিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় ভক্তিসংগীত তথা পূজাপর্যায়ের গান ধর্মবিশ্বাসে সাম্প্রদায়িক হওয়া সত্ত্বেও সাম্প্রদায়িক বিশ্বাস অপেক্ষা কবিজীবনের সত্যই তাতে অধিকতর প্রতিফলিত হয়েছে। তাই তো তাঁর প্রকৃতি পর্যায়ের ''আকাশভরা সূর্যতারা বিশ্বভরা প্রাণ'' গানটি ঋতুপর্যায়ের ভূমিকায় স্থাপিত হলেও এই গান যথার্থই পূজা পর্যায়ের।

কখনও সংগীত বিশেষজ্ঞগণ রবীন্দ্রনাথের পূজাপর্যায়ের সংগীতগুলিকে দুটি ভাগে ভাগ করে থাকেন। প্রথম ভাগের সংগীত সমূহকে বলা হয় ব্রহ্মসংগীত এবং দ্বিতীয় ভাগের সংগীতসমূহকে বলা হয় অধ্যাত্মসংগীত। ব্রহ্মসংগীত বলতে বোঝানো হয় রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রথমদিকের রচিত গানগুলি যেগুলি প্রথাগত ও পূর্বপ্রচলিত ব্রহ্মসংগীতের আদর্শানুসারী। ব্রাহ্মসমাজের নানা উৎসব উপলক্ষে রচিত এবং বাড়ীর অগ্রজ-অগ্রজাদের উৎসাহে রচিত যেগুলি রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মচেতনাধর্মী নয়। আর দ্বিতীয় ভাগের গানগুলি

ব্রাহ্মসমাজের প্রয়োজনে রচিত নয়, এগুলির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরানুভূতির প্রকাশ ঘটেছে যা তাঁর অধ্যাত্মচেতনারই ফলশ্রুতি।

ব্রহ্মসংগীতরূপে স্বদেশী গান রবীন্দ্রনাথও রচনা করেছেন। তাঁর বিখ্যাত 'জনগণমন-অধিনায়ক জয় হে ভারতভাগ্যবিধাতা' গানটিও আদি ব্রাহ্মসমাজে মাঘোৎসবে ব্রহ্মসংগীতরূপে গীত হয়। ১৯ বছর বয়সে ১৮৮০ সালে রবীন্দ্রনাথ প্রথম ব্রহ্মসংগীত রচনা করেন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'গীতবিতান কালানুক্রমিক সূচী প্রথম খন্ড' এ 'তুমি কি গো পিতা আমাদের' গানটিকে প্রথম রবীন্দ্ররচিত ব্রহ্মসংগীতরূপে উল্লেখ করেছেন। সেই থেকে সারা জীবন ধরেই রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বরবিষয়ক গান রচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সংগীত রচনায় যে তিনটি যুগের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, সেই তিনটি যুগ ধরেই রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসংগীত রচিত হয়েছে। প্রথম যুগে বিশেষভাবে পাওয়া গেল ভাঙা ব্রহ্মসংগীত ও পুরাতনী ধরনের গান সমূহ। মধ্যযুগে পাওয়া গেল রাগসংগীতানুগ সংগীত রচনা। এই সময় রাগসংগীতের কাঠামোয় স্বাধীন রীতিতে রবীন্দ্রনাথ পূজাপর্যায়ের গান রচনা করেন। গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য, গীতালি প্রভৃতির গান এই যুগে রচিত। শেষ যুগের গানগুলিতে পরিণত রবীন্দ্ররচনার বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত। রবীন্দ্রসংগীতের নানাবিধ বৈচিত্র্য এই পূজাপর্যায় গানেও সম্যক উপলব্ধি করা যায়। ধ্রুপদ, খেয়াল, টপ্পা, প্রভৃতি সংগীতবন্ধের অনুসরণে রচিত ব্রহ্মসংগীত যেমন পাওয়া যায়, লোকসংগীতানুগ সুরেও এই শ্রেণীর গান পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব সংগীতরীতিতেও পূজাপর্যায় গান পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ সৃষ্ট নতুন তালে রচিত অধিকাংশ গানই ব্রহ্মসংগীত। রামমোহন রায় থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত বিপুল সংখ্যক বাঙালী সংগীত রচয়িতা ব্রহ্মসংগীত রচনা করেন। তবে এর সর্বশ্রেষ্ঠ রূপটি রবীন্দ্রনাথের রচনায় প্রকাশ পেয়েছে। বাণী ও সুরের উৎকর্ষে এবং উভয়ের রসসম্মত সম্মিলনে বাংলা ভক্তিগীতির কালজয়ী রূপটি প্রকাশ পেয়েছে রবীন্দ্রনাথের পূজাপর্যায় গানে। ঈশ্বরানুগত্যের অতি গভীর অনুভব এই সংগীতমালায় এমন সুষমামন্ডিত হয়ে প্রকাশ পেয়েছে যে, তা বিশ্বাসী মানুষমাত্রকেই অনুপ্রাণিত করে। তাই ব্রাহ্মধর্মান্দোলন ক্ষীয়মান হয়ে আসলেও রবীন্দ্রনাথের পূজাপর্যায় গানের আদরণীয়তা ক্ষীয়মান হয়ে আসেনি। এ গান সাম্প্রদায়িক প্রার্থনা সংগীতের গন্ডীতে আবদ্ধ থাকেনি। একেশ্বর বোধের প্রমূর্ত সাংগীতিক বাণীরূপে রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসংগীত কালোত্তীর্ণ গৌরব অর্জনে সমর্থ হয়েছে।

ঠাকুরবাড়িতে ব্রহ্মসংগীতের প্রভাবঃ- ঈশ্বর, মানব এবং প্রকৃতি এই তিন ভুবনের নাগরিক রবীন্দ্রনাথ বোধ করি ঈশ্বরের প্রতিই তাঁর সর্বাধিক আনুগত্য প্রকাশ করেছেন সংগীতের মধ্য দিয়ে। পারিবারিক ব্রাহ্মধর্মের অনুষ্ঠান উৎসবে সংগীত রচনায় যে ঐতিহ্যে তিনি লালিত হয়েছিলেন, সেখানে গানের সুর কেবল শিল্পকর্ম বা চিত্তবিনোদন মাত্র ছিল না, সুরকে অন্তরের গভীরে ভক্তির সোপানরূপে গ্রহন করার বিশ্বস্ত প্রমাণ পাওয়া যায়।

কবি যখন নিজে একথা স্বীকার করেছেন,

ঘরে আমার রাখতে হয় যে বহুলোকের মন
অনেক বাঁশি অনেক ফাঁসি অনেক আয়োজন
বঁধূর কাছে আসার বেলায় গানটি শুধু নিলেন গলায়
তারই গলার মালা করে করব মূল্যবান।

তখন এই উপলব্ধিকে কেবল অতিরঞ্জন বলে আমরা অস্বীকার করতে পারিনা।

বস্তুত ভক্তিপ্রেরণার সঙ্গে সংগীত সৃষ্টির ও সুরবন্ধনের প্রেরণা রবীন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ প্রমুখ ঠাকুর পরিবারের সকল প্রতিভাশালীকেই উদ্দীপ্ত করেছিল, তার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। বিশিষ্টগুণী আচার্য গায়কদের কণ্ঠে প্রচারিত ও শিক্ষালব্ধ ধ্রুপদ ধামার হিন্দুস্থানী রাগরাগিনী আশ্রয়ী গানগুলির সুর যখন তাঁদের মাতিয়ে রেখেছে, তখন সেই প্রবল সুরের দানকে তাঁরা ভক্তিনৈর্বেদ্য করে আপনাদের কৌশল সাধনার নামে উৎসর্গ করতে চেয়েছেন। তাই সেই সব সুরের উপর বাঙলা কথা বলিয়ে বাঙলা ব্রহ্মসংগীতের ভান্ডার পূর্ণ করতে পারলে অনেকের কাছ থেকে উৎসাহ পাওয়া যাবে, এই আগ্রহে ঠাকুর পরিবারের প্রায় সকলেই হিন্দি গানকে বাংলায় রূপান্তরিত করতে শুরু করেছিলেন। যদুভট্টের গান বাঙলায় রূপান্তরিত করা যেন একটি আনন্দময় প্রতিযোগিতা ছিল। তাছাড়া ধ্রুপদী রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় ও শান্তিপুরের রাজচন্দ্র রায়ের গান সম্পর্কে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ লিখেছিলেনঃ ‘‘ইহাদের গান ভাঙিয়া তখন আমি ও বড়দাদা অনেক ব্রহ্মসংগীত রচনা করিয়াছিলাম।’’ সোনার তরীর বৈষ্ণব কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন, ‘‘প্রিয়জনে যাহা দিতে চাই তাই দিই দেবতারে।’’ এঁরাও সকলে এঁদের শিল্পী জীবনের শ্রেষ্ঠসাধনা ও শিক্ষাকে দেবতার বেদীতে অর্ঘ্যরূপে নিবেদন করে ধন্য হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ প্রথম জীবনে এইভাবে অসংখ্য মার্গসংগীত ও হিন্দি গানের সুর অবলম্বন করে ব্রহ্মসংগীত সৃষ্টি করেছেন। যদুভট্টের ‘ফুলিবন ঘন মোর আয় বসন্তরি’ গান অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ রচনা করেন ‘আজি মম মন চাহে জীবনবন্ধু রে’। একটি সাধারণ প্রকৃতি বর্ণনার গানের বাকগত তুচ্ছতাকে কী নিবিড়

ভক্তিভাবে দ্রবীভূত করে দেওয়া হল। ভগবতনুভূতির নিবিড়তাকে কে কতখানি গানে রূপান্তরিত করতে পারেন, যেন তার প্রতিযোগিতার একটি নিঃশব্দ আয়োজন লক্ষ্য করি একই সুরে রচিত একাধিক ব্যক্তির গীতরচনায়। যদুভট্টের কাফি সুরে রচিত ‘রুমঝুম বরখে আজু বাদরবা গিয়ে বিদেশ মোরি’, এই প্রেমের গানটিকে রূপান্তরিত করে দ্বিজেন্দ্রনাথ লিখলেন-

“দীনহীন ভকতে নাথ কর দয়া অনাথ নাথ তুমি

হৃদয়রাজ বিরাজো নিশিদিন হৃদিমাঝে।

তব সহবাস-আশে আনন্দে হৃদয় ভাসে

তোমা বিনা নিশিদিন মন নাথ নাথ ধ্যায়ে”।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথও ঐ সুরকে বরণ করে অন্যতালে আর একটি ব্রহ্মসংগীতের জন্ম দিলেনঃ

“তুমি হে ভরসা মম অকুল পাথারে

আর কেহ নাহি যে বিপদভয়ে বারে।

এ আঁধার যে তারে।

এক তুমি অভয়পদ জগৎ সংসারে

কেমনে বল দীনজন ছাড়ে তোমারে”।

শেষ পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথকেও দেখি সেই সুর গ্রহণ করে ভক্তি-উপাসনার বাঙ্ময় নৈবেদ্য রচনা করতে –

শূন্য হাতে ফিরি হে, নাথ, পথে পথে

ফিরি হে দ্বারে দ্বারে

চিরভিখারি হৃদি মম নিশিদিন চাহে কারে

চিত্ত না শান্তি জানে, তৃষ্ণা না তৃপ্তি মানে

যাহা পাই তাই হারাই, ভাসি অশ্রুধারে।

সকল যাত্রী চলি গেল, বহি গেল সব বেলা

আসে তিমির যামিনী ভাঙিয়া গেল মেলা

কত পথ আছে বাকি, যাব চলি ভিক্ষা রাখি

কোথা জ্বলে গৃহপ্রদীপ কোন সিন্ধু পারে।

রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসংগীতঃ- এইভাবে নতুন গীত-আন্দোলনের আবহাওয়াতেই রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসংগীতগুলি রচিত হতে থাকে, নিছক আনুষ্ঠানিক ধর্মবোধ ও কর্তব্য পালনের অঙ্গীকার থেকে নয়। ঈশ্বর ও ভক্তের নিবিড় ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক সংসারের শত কর্মভাবনার ভিতর দিয়ে প্রবহমান নীরব বিশ্বাস বিশ্বজগতের অচিন্ত্যশক্তির সঙ্গে কবিচিত্তের ব্যক্তিগত মানবসম্বন্ধ স্থাপন ঐশ্বর্য-মাধুর্য্যের মধ্যে বিলসিত ধর্ম-চেতনা-রবীন্দ্রনাথের ভক্তিসংগীতের প্রধান সম্পদ। পারিবারিক ধর্মানুশীলনের অভ্যস্ত গন্ডীতে লালিত হওয়ায় ব্রহ্মসংগীতের ঐতিহ্যকে কবি ছোটবেলা থেকেই গ্রহণ করেছিলেন এবং প্রতি বৎসর বিভিন্ন ধর্মোৎসব উপলক্ষে গীতরচনা তাঁর প্রায় অভ্যাসে পরিণত হয়েছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথের পূজা পর্যায়ের গানগুলি নিছক ব্রহ্মসংগীত নয়। ব্রহ্মসংগীতের গোষ্ঠীকেন্দ্রিকতা ও ভক্তি প্রকাশের অভ্যস্ত রীতি রবীন্দ্রনাথের অভিপ্রেত হয়নি, ব্রাহ্মের অদ্বৈত অপৌত্তলিক ঈশ্বরোপাসনাই রবীন্দ্রনাথের পূজাগীতের একমাত্র অভীষ্ট নয়।

এই কারনে তথাকথিত ব্রাহ্মসমাজের গানগুলিকে যেখানে শুষ্ক বৈরাগ্য, জীবনবিমুখ পারত্রিকতা, মতানন্দ বিরোধী ভীতিপ্রদ তত্ত্বকথা প্রচারিত হয়েছে, সেখানে রবীন্দ্রনাথের পূজা পর্যায়ের গানে জীবনের প্রতি গভীর প্রীতি, মর্তমমতা, দিনযাপনের আনন্দ ইত্যাদি প্রতিফলিত হয়েছে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের পূজা পর্যায়ের গানে তাঁর পারিবারিক ধর্মবোধের বদলে ব্যক্তিচিত্তের ধর্মানুভূতিরই সপ্রীত বিকাশ ঘটেছে।

রবীন্দ্রনাথের যাবতীয় ভক্তিসংগীত তথা ধর্মসংগীত তথা পূজাপর্যায়ের গান ধর্মবিশ্বাসে সাম্প্রদায়িক হওয়া সত্ত্বেও সাম্প্রদায়িক বিশ্বাস অপেক্ষা কবিজীবনের সত্যই অধিকতর প্রতিফলিত হয়েছে, সেইজন্যই সেগুলি আমাদের সকলের সমাদরনীয়।

'আকাশ ভরা সূর্য তারা বিশ্বভরা প্রাণ
তাহারই মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান
বিস্ময়ে তাই জাগে আমার গান'।

এই গানটি প্রকৃতি পর্যায়ের প্রথম গান হলেও এক অর্থে ইহা যথার্থই পূজা পর্যায়ের বলে আমরা দাবী করতে পারি।

কোন কোন সংগীতালোচক রবীন্দ্রনাথের পূজাপর্যায় সংগীত রচনাকে দুটি ভাগে বিভক্ত করে থাকেন। এই বিভাজন অত্যন্ত যুক্তিসংগত। প্রথম ভাগের গীতসমূহকে বলা হয়েছে রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসংগীত বা তথাকথিত ব্রহ্মসংগীত। দ্বিতীয় ভাগের গানসমূহকে বলা হয় রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মসংগীত। ব্রহ্মসংগীত বা তথাকথিত

ব্রহ্মসংগীত বলতে বোঝানো হয়েছে সেইসব গানকে যেগুলো রবীন্দ্রনাথ জীবনের প্রথম দিকে রচনা করেন, যেগুলো ছিল প্রথাগত ও পূর্ব প্রচলিত ব্রহ্মসংগীতের আদর্শ ও রূপানুসারী, যেগুলো ব্রাহ্মসমাজে পালনীয় নানা উৎসব অনুষ্ঠান উপলক্ষে রচিত, যেগুলো রচনায় পশ্চাতে প্রেরণা হিসাবে কাজ করেছে বাড়ির বড়দের দৃষ্টান্ত ও পারিবারিক উৎসাহ ইত্যাদি। অর্থাৎ এইসব গান রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মচেতনার বাণীবাহী নয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর পূজা পর্যায় গানসমূহ রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্মচেতনার ফলশ্রুতি। এরা ব্রাহ্মসামাজিক প্রয়োজনে রচিত নয়। এদের মধ্যে দিয়ে কবির ঈশ্বরানুভূতি প্রকাশ লাভ করেছে। ইংল্যান্ড থেকে ফিরে বিংশতিবর্ষীয় রবীন্দ্রনাথ মাঘোৎসবের জন্য আটখানি গান রচনা করেন।

গীতাঞ্জলির রচনাকালের পূর্ব পর্যন্ত তাঁর রচিত ব্রহ্মসংগীতসমূহ তাঁদের পারিবারিক ধর্মাচরণের প্রেরণায় রচিত, এবং গীতাঞ্জলির রচনাকাল থেকে রচিত পূজাপর্যায় গানসমূহ রবীন্দ্রনাথের যথার্থ ঈশ্বর ভাবনা সম্পৃক্ত অধ্যত্মসংগীত। প্রাক্গীতাঞ্জলি ব্রহ্মসংগীত সম্পর্কে প্রভাতকুমার জানিয়েছেন যে ব্রাহ্মসমাজের ধর্মভাবকে ভাষা ও সুর দান করেই কবির এই সকল ব্রহ্মসংগীতগুলি রচিত অর্থাৎ এইগুলি 'রচিত গান' 'ভক্তহৃদয়ের বেদনা-সঞ্জাত ভাবসংগীত' নয়। তিনি বলেছেনঃ ''রবীন্দ্রনাথের যথার্থ অধ্যাত্মসংগীতের পালা শুরু হয় গীতাঞ্জলির পর্বে, তাহার পূর্বের পর্বের গানকে ব্রহ্মসংগীত বলিব।''

উপসংহারঃ সঙ্গীত কেবলমাত্র বিনোদনের একটি মাধ্যম নয়। সৃষ্টিশীলতার সঙ্গে শিক্ষামূলক পরিসরেও সঙ্গীতের প্রভাব রয়ে যায়। আদি অনন্তকাল ধরে তাই প্রবহমান সঙ্গীতের সঙ্গে মানুষের এক অবিচ্ছেদ্য সখ্য রয়ে গিয়েছে।

রামমোহন রায় থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্য্যন্ত বিপুল সংখ্যক বাঙালী সংগীত রচয়িতা ব্রহ্মসংগীত রচনা করেন। তবে এটি প্রকৃষ্টতম রূপে রবীন্দ্রনাথের রচনায় প্রকাশ পেয়েছে। বাণী ও সুরের সাহচর্য এবং ভাবের সম্মিলিত প্রয়াসে বাংলা ভক্তিগীতির রূপটি বিশেষভাবে প্রকাশ পেয়েছে তাঁর পূজার গানে। সে পূজা, ঈশ্বর, মানব, প্রকৃতি সর্বত্রই বিরাজমান। এ পূজাসংগীত শুধু সাম্প্রদায়িক প্রার্থনা সংগীতের গন্ডীতে আবদ্ধ হয়ে থাকেনি, কালের নিয়মে তা ভক্তিগীতির পর্যায়ে উপনীত হয়েছে।

উল্লেখপঞ্জীঃ-

১) ডঃ অরুণ কুমার বসু, বাংলা কাব্যসংগীত ও রবীন্দ্রসংগীত, দে'জ পাবলিশিং, কোলকাতা, ফেব্রুয়ারী, ১৯৭৮, পৃঃ ১৩১।

২) করুণাময় গোস্বামী, রবীন্দ্রসংগীত পরিক্রমা, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৩।

৩) কাজল সেনগুপ্ত, রবীন্দ্রসংগীত অন্বেষা; সোহিনী – সাহানা; ১৯৮২, কলকাতা।

৪) ব্রহ্মসংগীত ও রবীন্দ্রনাথের অসাম্প্রদায়িকতা, অসিত দত্ত রচিত গীতলেখা (রবীন্দ্রসংগীত মন্থন), গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধ, ঘোষ পাবলিশিং, ১৩৯৫, কলকাতা।

৫) অরুণ কুমার বসুঃ- রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসংগীতঃ- সুচিত্রা মিত্র ও সুভাষ চিধুরী (সম্পাদিত); রবীন্দ্রসংগীতায়ণ ১; প্যাপিরাস; ১৯৮২, কলকাতা।

৬) অনন্তকুমার চক্রবর্তীঃ- ব্রহ্মসংগীত ও রবীন্দ্রনাথ, শিলাদিত্য; সম্পাদকঃ- বিমল কর, বর্ষ ২, সংখ্যা ১২, মে ১৬-৩১, ১৯৮৩, কলকাতা।

৭) উপাসনার সঙ্গে সঙ্গীতকে কীভাবে মিলিয়ে ছিলেন রামমোহন। গানে এক নতুন দিগন্ত - অমিত দাস, আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা, রবিবার ১৮ই জুন, ২০২৩ (১০২ বর্ষ, ১০২ সংখ্যা, ৩ আষাঢ়, ১৪৩০)

৮) অরুণ কুমার বসুঃ- ব্রহ্মসংগীত ও ব্রাহ্মসমাজ; রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা; বর্ষ ১১, সংখ্যা ১, ১৩৮০, কলকাতা।

৯) জয়দেব রায়ঃ- রবীন্দ্রনাথ ও ব্রহ্মসংগীত; শিল্প ও সাহিত্য, বর্ষ ৭, সেপ্টেম্বর ১৯৮২, কলকাতা।

১০) দিলীপকুমার বিশ্বাসঃ- রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মসংগীত; দেশ, সম্পাদক – সাগরময় ঘোষ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৯৩, কলকাতা।

NAME : DR. MAUSUMI PAL

ASSISTANT PROFESSOR IN MUSIC

PURNIDEVI CHOWDHURY GIRL'S COLLEGE

BOLPUR, BIRBHUM

PINCODE : 731204

Ph. No. : 9830353952

Email Id : palkundu.mausumi9@gmail.com